وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ এ আয়াতে اٰيَةَ الَّيْلِ এর মর্মার্থ হল চাঁদ আর اٰيَةَ النَّهَارِ--এর মর্মার্থ সূর্য। এতদুভয়ের উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, এগুলোর দ্বারা তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও মাসের তারিখ হিসাব করতে পার। আর সূরা রহমানে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ--এতে বলা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টির মাধ্যমেই তারিখ, মাস ও বর্ষের হিসাব জানা যেতে পারে।

কিন্তু চাঁদের দ্বারা যে মাস ও তারিখের হিসাব করা যায়, তা চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতার আলোকে সপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে সূর্যের হিসাব সৌর বিজ্ঞানীদের ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে চন্দ্র ও সূর্যের উল্লেখের পর যখন এগুলোর মনযিল নির্ধারণের কথা বলা হল, তখন একবচন সর্বনাম ব্যবহারে قَدَّرَهٗ বলে শুধু চাঁদের মনযিলসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়।

আর যেহেতু ইসলামের নির্দেশাবলীতে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে এ বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে তার অনুশীলন প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে সহজ হয়---তা লেখাপড়া জানা লোকই হোক কিংবা অশিক্ষিত হোক, শহরে হোক কিংবা পল্লীবাসী হোক। এজন্যই সাধারণত ইসলামী হুকুম-আহকামে (বিধি-বিধানে) চান্দ্র বর্ষ, মাস ও তারিখের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইসলামী ফরয ও নির্দেশাবলীও চাঁদের হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সৌর হিসাব রক্ষা করা কিংবা ব্যবহার করা জায়েয নয়। বরং কেউ যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও ইদ্দতের ক্ষেত্রে শরীয়ত মুতাবিক চান্দ্র হিসাব ব্যবহার করে এবং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সৌর হিসাব ব্যবহার করতে চায়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। তবে শর্ত হল এই যে, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের মাঝে যেন চান্দ্র হিসাব প্রচলিত থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে রমযান, হজ্জ প্রভৃতির সময় জানতে পারা যায়। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ছাড়া অন্য কোন মাসই জানা থাকবে না এমনটি যেন না হয়। ফিকাহ্‌বিদগণ চান্দ্র হিসাবকে বাঁচিয়ে রাখা মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়াহ্‌ সাব্যস্ত করেছেন।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবীগণের রীতি, মহানবী (সা)-র সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মধারায় চান্দ্র হিসাবই ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এর অনুবর্তিতা সওয়াব ও বরকতের কারণ।

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহান কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আলোর এ দু'টি মহা উৎস অবস্থানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং অতপর সেগুলোর পরিক্রমণের জন্য এমন পরিমাপ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে বর্ষ, মাস, তারিখ ও সময়ের প্রতিটি মিনিটের হিসাব জানা যেতে পারে। এদের গতিতে না কখনো পরিবর্তন সাধিত হয়, না কোন দিন আগপাছ হয় আর না কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। এরই অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য হিসাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থক সৃষ্টি করেননি, বরং এগুলোর মাঝে বিরাট বিরাট হিকমত এবং মানুষের জন্য অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এরা অতি পরিচ্ছন্নভাবে এ সমস্ত প্রমাণ সেসব লোকদের সামনে তুলে ধরে যারা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান।

এমনিভাবে দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, রাত ও দিনের ক্রমাগমন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে সমুদয়ের মাঝে সে সমস্ত লোকের জন্য (তওহীদ ও পরকালের) প্রমাণ বিদ্যমান, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে।

তওহীদের বা একত্ববাদের প্রমাণ তো হলো ক্ষমতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্যের অনন্যতা, কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে সমুদয়কে সৃষ্টি করা এবং এমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলোর পরিচালনা, যা না কখনো বিঘ্নিত হয়, না পরিবর্তিত হয়।

আর আখিরাত তথা পরকালের প্রমাণ এজন্য যে, যে বিজ্ঞ সত্তা এ সমুদয় সৃষ্ট সামগ্রীকে মানুষের ফায়দার জন্য বানিয়ে একটা সুগঠিত ব্যবস্থার অনুবর্তী করে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এমনটি হতেই পারে না যে, এই সেবাব্রতী বিশ্বকে তিনি অহেতুক শুধু খাবার-দাবার জন্য কিংবা ভোগবিলাসের নিমিত্ত সৃষ্টি করে থাকবেন ; এদের জন্য করণীয় কিছুই নির্ধারণ করে দেবেন না। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হল যে, সেবাব্রতী এ বিশ্বের উপরও কিছু বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যক তখন একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এ সমস্ত বাধ্যবাধকতা (তথা আরোপিত দায়দায়িত্ব) সম্পাদনকারী ও লংঘনকারীদের কোথাও কখনো একটা হিসাব-নিকাশ হবে এবং যারা তা সম্পাদনকারী হবে তারা ভাল প্রতিদান পাবে আর যারা লংঘনকারী তারা শাস্তির অধিকারী হবে। সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ পৃথিবীতে প্রতিদান ও শাস্তির এ নিয়ম নেই—এখানে অনেক সময় অপরাধী ব্যক্তি সৎ-সজ্জনের চেয়েও ভালভাবে জীবন-যাপন করে। কাজেই হিসাব-নিকাশের একটা দিন নির্ধারিত হবে। তাই নাম হল কিয়ামত ও আখিরাত।

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا

يَكْسِبُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ دَعْوٰىهُمْ
فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শন-সমূহ সম্পর্কে বেখবর। (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (৯) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে হিদায়ত করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। তাদের তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ সুখময় কাননকুঞ্জে। (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্'। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, সমস্ত প্রশংসা 'বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' বলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব লোকের মনে আমার সাক্ষাৎ লাভের প্রেরণা নেই এবং তারা পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট (প্রকৃতপক্ষেই যাদের মনে পরকালের বাসনা নেই) বরং এতেই বিভোর হয়ে আছে (আগত দিনের কোনই খবর নেই) এবং যারা আমার নির্দেশসমূহ (যা নবী আগমনের প্রমাণ) সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল, এমন লোকদের ঠিকানা হল দোযখ (তাদেরই গর্হিত এসব) কার্যকলাপের দরুন। (আর) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তাদের ঈমান আনার ফলশ্রুতিতে তাদের উদ্দিষ্ট (জান্নাত) পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। তাদের (এ বাসস্থানের) তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে শান্তিনিকুঞ্জে। (বস্তুত তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানকার বিস্ময়কর বস্তুসামগ্রী হঠাৎ দেখতে পাবে, তখন) তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে—"সুবহানাল্লাহ্"। আর (অতপর যখন তাদের পরস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হবে, তখন) তাদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় হবে 'আস্সালামু আলায়কুম' বলে। তারপর (যখন নিশ্চিন্তে সেখানে গিয়ে বসবে এবং নিজেদের অতীত বিপদাপদ আর বর্তমানের পরিচ্ছন্ন চিরন্তন বিলাসের মাঝে তুলনা করবে, তখন) তাদের (তখনকার আলাপের) শেষ বাক্য হবে, আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (যেমন, অন্যান্য আয়াতে রয়েছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের কষ্টের অবসান করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তওহীদ ও আখিরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক 'সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। (এক) সে শ্রেণী যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতই কোন জীব নই, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনাভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সেসবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন, কোরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না, চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কারো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল।"

তৃতীয়ত, "এসব লোক আমার নির্দেশাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হত না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফলতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখিরাতে তাদের শাস্তি হল এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরিতাপের বিষয় যে, কোরআন করীম কাফির ও মুনকেরদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোন ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ, এতদসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাঁদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মনে হত, এঁর মনে অবশ্যই কোন মহান সত্তার ভয় এবং কোন হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসূম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

(দুই) এ আয়াতে সে সব ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মুতাবিক সৎকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে।

কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ

অর্থাৎ তাঁদের পরওয়ারদিগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হিদায়ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হল পথ প্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণীর প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

চতুর্থ আয়াতে জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ও আচরণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত— دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ এখানে

دعوى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دعوى অর্থ হল দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হল এই যে, জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাচঞা করাকে, কিন্তু سبحنك اللهم (সুবহানাকাল্লাহুম্মা)-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর প্রার্থনা নেই। একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসিগণ জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত্ত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত অবশ্যকরণীয় কোন ইবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব। এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হত, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

আর ইমাম তাবারী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া-প্রার্থনা করতেন।—(তফসীরে কুরতুবী)

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রিওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন

তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের কাম্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। বস্তুত সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন।---(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী) সুতরাং এ হিসাবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ- تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে, যার মাধ্যমে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা 'আহ্লান ওয়া সাহ্লান' প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سلام--এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, তোমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হিফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে ঃ- سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দুটি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌঁছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে।---(রূহুল মা'আনী)

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে। ---الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দীন সুহ্‌রা-ওয়ার্দী (র) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌঁছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রিফতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী-রসূলগণের হত। আর নবী-রসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমুদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হল এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ—এতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ত গুণ, যাতে যাবতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হল 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ্ তা'আলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তাঁর জালালী গুণ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুবভতা গুণ প্রকাশ করবেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। আর এই হবে তাঁদের রাত-দিনের কর্ম।

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, জান্নাতবাসীরা যখন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ বলবেন, তখন এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলবেন।

—(রূহুল-মা'আনী)

আহকাম ও মাসায়েল

কুরতুবী আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেছেন যে, জান্নাতবাসীদের আমল অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ 'বিসমিল্লাহ্'-এর মাধ্যমে আরম্ভ করা এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্'-এর মাধ্যমে শেষ করা সুন্নত। রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন

—বান্দা যখন কোন কিছু পানাহার করবে, তখন তা বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়ে শুরু করবে আর যখন সমাপ্ত করবে, তখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ।

দোয়া-প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা মুস্তাহাব। কুরতুবী বলেছেন যে, এতদসঙ্গে সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ
فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١١ وَاِذَا
مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٢ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا
ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٣ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝١٤ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا
بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ
اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ
اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ۝١٥ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٦ فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٧

(১১) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌঁছে দেন, যত শীঘ্র তারা কল্যাণ কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে! (১৩) অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালিম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে! (১৪) অতপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর। (১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোকেরা বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১৭) অতপর তার চেয়ে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর (তাদের তাড়াহুড়া অনুযায়ী) যথাশীঘ্র অকল্যাণ আরোপ করে দিতেন, যেমনটি তারা লাভের জন্য করে থাকে (এবং তাদের সে তাড়াহুড়া অনুযায়ী সে কল্যাণ যথাশীঘ্র তিনি দিয়েও দেন), তাহলে তাদের উপর প্রতিশ্রুত (আযাব) কবেই পুরা হয়ে যেত। (কিন্তু আমার প্রজ্ঞা ও হিকমত, যার বিবরণ একটু পরেই আসছে, তা চায় না)। কাজেই আমি তাদেরকে যাদের মনে আমার নিকট ফিরে আসার ভাবনাটিও নেই, (আযাব না দিয়ে কয়েক দিনের জন্য) নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখি, যাতে তারা নিজেদের ঔদ্ধত্যের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে (এবং আযাবপ্রাপ্তির উপযোগী হয়ে যায়)। আর (সে হিকমত হল এই যে,) যখন মানুষকে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন কোন লোককে) কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আমাকে ডাকতে আরম্ভ করে—(কখনো) শুয়ে, (কখনো) বসে, (কখনো) দাঁড়িয়ে। (অথচ তখন কোন মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির কথা মনেই

থাকে না---ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ অতপর যখন (তার দোয়া-প্রার্থনার পর আমি তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন আবার স্বীয় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে (এবং আমার সাথে এমনভাবে নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় যে,) সে যে কষ্টে পতিত হয়েছিল, তা দূর করার জন্য যেন আমাকে কখনো ডাকেইনি। (সুতরাং আবারো তেমনি শিরকী কথাবার্তা বলতে শুরু করে---نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا) এসব সীমালংঘনকারীদের (অসৎ) কার্যকলাপ তাদের কাছে এমন মনঃপূত মনে হয় (যেমন এখনই আমরা বর্ণনা করছি)। বস্তুত আমি তোমাদের পূর্বে বহু দলকে (বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে) ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুম (অর্থাৎ কুফরী-শিরকী) করেছে। অথচ তাদের কাছে তাদের পয়গম্বরও দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসে-ছিলেন। তারা (চরম বিদ্বেষবশত) এমন ছিলই বা কবে যে, ঈমান আনতে পারে? আমি অপরাধীদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি (যেমন, আমরা এখনই বর্ণনা করলাম)। তারপর আমি পৃথিবীতে তাদের স্থলে তোমাদেরকে আবাদ করেছি যাতে (বাহ্যিক---ভাবেও) আমি দেখে নিতে পারি যে, তোমরা কি ধরনের কার্যকলাপ কর---(তেমনি শিরকী-কুফরীই কর, না ঈমান আন)। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হয়, যা একান্তই পরিষ্কার, তখন এসব লোক যাদের আমার কাছে প্রত্যাবর্তনের কোন ভাবনাই নেই (আপনার কাছে) বলে, (হয়) একে বাদ দিয়ে (পূর্ণ) দ্বিতীয় কোন কোরআন নিয়ে আসুন (যাতে আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য থাকবে না) না হয় (অন্তত) এ কোরআনেই কিছু সংশোধন করে দিন। [অর্থাৎ আমাদের মতবাদ বিরোধী বক্তব্য এর থেকে বিলুপ্ত করে দিন। তাদের এ যুক্তির মর্মার্থ হল এই যে, তারা কোরআনকে মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম বলেই জানত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে উত্তর শিখিয়ে দিতে গিয়ে বলেন---] আপনি বলে দিন যে, (এ থেকে এ ধরনের বক্তব্য মুছে দিলে প্রকৃতপক্ষে কেমন হবে, না হবে সে বাদ দিলেও) আমার দ্বারা এমনটি হতেই পারে না যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন রকম সংশোধন করি। (তদুপরি কোন অংশের বিলোপ করাই যখন সম্ভব নয়, তখন গোটাটা বিলোপ করা তো আরো বেশি অসম্ভব। কারণ, এটি আমার কালাম তো নয়ই; বরং আল্লাহ্র এমন কালাম যা ওহীর মাধ্যমে এসেছে। বিষয়টা যখন এরূপ, তখন) আমি তো তারই অনুসরণ করব যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পৌঁছেছে। (আর খোদা না করুন,) যদি আমি (ওহীর অনুসরণ না করে; বরং) স্বীয় পালন-কর্তার না-ফরমানী করি, তাহলে আমি এক বড় কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করি (যা পাপীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এবং যা পাপের দরুন তোমাদেরও ভাগ্যে রয়েছে। সুতরাং আমি তো এ আযাব কিংবা তার কারণ অর্থাৎ পাপ কার্যের দুঃসাহস করতেই পারি না। আর যদি এর ওহী হওয়ার ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকে কিংবা যদি এরা একে আপনার কালাম বলেই মনে করে, তবে) আপনি এভাবে বলুন যে, (একথা

তো সুস্পষ্ট যে, এ কালাম অনন্য; এমনটি তৈরি করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই—তা আমি হই বা তোমরাই হও। অতএব,) আল্লাহ্ তা'আলা যদি চাইতেন (যে, আমি তোমাদেরকে এ অনন্য কালাম শোনাতে না পারি এবং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এর সন্ধান না দিতে ইচ্ছা করতেন,) তবে (আমার উপর একে অবতীর্ণই করতেন না।) না আমি তোমাদেরকে এটি পড়ে শোনাতাম, আর না আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর সন্ধান দিতেন। (অতএব, যখন আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি এবং আমার মাধ্যমে তোমরা এর সন্ধান পাচ্ছ, তখন এতেই বোঝা যায় যে, এ অনন্য সাধারণ কালাম শোনানো এবং এর সন্ধান দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অনভিপ্রেত। আর ওহী ব্যতীত এটি শোনানো কিংবা এর সন্ধান দেওয়া এর মু'জিযা বা অনন্যতার কারণেই সম্ভব নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি অবতীর্ণ ওহী এবং আল্লাহ্ তা'আলারই কালাম।) কারণ, আমি তো (এ কালাম প্রকাশ করার) পূর্বেও বয়সের একটা বিরাট অংশ তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি (যদি এটি আমার কালাম হয়ে থাকে, তবে হয়, এতকাল পর্যন্ত এ ধরনের একটি বাক্যও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, না হয়, এমন বিরাট কালাম হঠাৎ করে তৈরি করে ফেলেছি—অথচ এমনটি একান্তই বিবেকবিরুদ্ধ ব্যাপার—) তারপরও কি তোমাদের মধ্যে এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নেই? যাক, এটি আল্লাহর কালাম বলে প্রমাণিত হয়ে যাবার পরেও আমার কাছে তোমরা এর সংশোধন, পরিবর্তন দাবি করছ এবং একে মানছ না, তখন জেনে রাখ,) সে ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যেমন, তোমরা আমাকে এর পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছ) কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে (যেমন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে প্রস্তাব দিচ্ছ)। নিঃসন্দেহে এহেন অপরাধীদের প্রকৃতই পরিত্রাণ নেই (বরং এরা অনন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে, যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী। সেজন্যই যখন তাদেরকে আখিরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আযাব ডেকে আন। অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন আসে না? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিল ঃ "আয় আল্লাহ্, এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।"

প্রথম আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হিকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদ্দোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বদ্দোয়াগুলোও তেমনি-ভাবে যথাশীঘ্র কবূল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবূল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবূল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদ্‌দোয়া করে বসে অথবা আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না; বরং অবকাশ দেন যাতে অস্বীকৃতরাও বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদ্‌দোয়া করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জরীর তাবারী (র) কাতাদাহ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এবং বুখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (র)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগত নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদের ধ্বংসপ্রাপ্তির জন্য বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশত সহসাই এ সব দোয়া কবূল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ "আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবূল না করেন।" আর শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (র) বলেছেন, আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বান্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশত কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না।—(কুরতুবী)

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবূলিয়ত বা প্রার্থনা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবূল হয়ে যায়। সেইজন্য রসূলে করীম (সা) বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং এ দোয়া সাথে সাথে কবূল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত' -এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ সমুদয় রেওয়ায়েতের সারমর্ম হল এই যে, উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য যদিও আখিরাতে অস্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের দাবি তাৎক্ষণিক আযাবের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সাধারণভাবে এতে সেসব মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোন দুঃখ-কষ্ট

ও রাগের দরুন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের জন্য বদদোয়া করে বসে। আল্লাহ্ তা'আলার রীতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণাবশত উভয়ের সাথে একই রকম যে, তিনি এ ধরনের বদদোয়া সাথে সাথে কার্যকর করেন না, যাতে করে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখিরাতে অস্বীকৃত লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যদেরকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ-বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে, কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ্ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আয়াতে বলেছেন ঃ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ- لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা

প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খিলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর—বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়দায়িত্ব।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম—এ চার আয়াতে আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃত লোক-দের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে। এ সব লোক না জানত আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত, না ওহী ও রিসালত সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করত। যে কোরআন করীম রসূল (সা)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সা)-র কাছে দাবি জানায়, এই যে কোরআন, এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধি দাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্তত এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কোরআন করীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী (সা)-কে হিদায়ত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিনঃ এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওহীর তাঁবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। তোমাদেরকে এ কালাম শোনানো না হোক এটাই যদি আল্লাহ্ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শোনাতাম, না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শোনানো হোক এটাই যখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোন রকম কম-বেশি করতে পারে?

অতপর কোরআন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলীলের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ

অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর যে, কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য-কবিতা বলতে কিংবা কোন কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরের এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। সারা জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) সত্য ও বিশ্বস্ত। কোরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোরআন করীমের এ দলীল-যুক্তি শুধু কোরআনের ঐশী বাণী হওয়ারই পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয়, বরং সাধারণ আচার-অনুষ্ঠানে ভালমন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়েরও একটি নীতি বাতলে দিয়েছে। কাউকে কোন পদ বা নিয়োগ দান করতে হলে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই করার উত্তম পদ্ধতি হল তার বিগত জীবনের পর্যালোচনা। যদি তাতে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকে, তবে ভবিষ্যতেও তা আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিগত জীবনে যদি সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে আগামীতে শুধু তার বলা-কওয়ায় তার উপর ভরসা করা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। ইদানীং নিয়োগ ও পদ বণ্টনে এবং দায়িত্ব সমর্পণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে এবং সেকারণে যেসব হাঙ্গামা-উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেসবের কারণও এই প্রকৃতিগত পদ্ধতি পরিহার করে প্রথাগত বিষয়াদির পেছনে পড়া।

অষ্টম আয়াতে এই একই বিষয়ের অতিরিক্ত তাকীদ এসেছে যাতে কোন বাণী বা কালামকে ভ্রান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য কঠিন আযাবের কথা বলা হয়েছে।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا
أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن
رَّبِّهِۦ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

(১৮) আর উপাসনা করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশ-কারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পূতঃ-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত, ; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত। (২০) বস্তুত তারা বলে, তার কাছে তার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়েবের কথা আল্লাহ্ই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এরা আল্লাহ্ (তা'আলার তওহীদ)-কে পরিহার করে এমন সব বস্তুর উপাসনা করছে, যা (উপাসনা-ইবাদত না করার ক্ষেত্রে) না তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে, আর নাইবা (ইবাদত করার কারণেও) তাদের কোন উপকার করতে পারে। (এরা নিজের পক্ষ থেকে যুক্তিহীনভাবে একটা উপকারিতা দাঁড় করিয়ে) বলে যে, এ (উপাস্য)-গুলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের (জন্য) সুপারিশকারী—(সেইজন্য আমরা এগুলোর ইবাদত করি।) আপনি বলে দিন, (তাহলে) তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বস্তু সম্পর্কে অবহিত করছ, যা আল্লাহ্ জানেন না আসমানে কিংবা যমীনে? (অর্থাৎ যে বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার অবগতির ভেতরে নেই তার অস্তিত্ব অসম্ভব। কাজেই তোমরা এক অসম্ভব বস্তুর পেছনে পড়ে আছ।) আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত লোকের শির্‌ক (ও অংশীবাদ) থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। আর (প্রথমে) সমস্ত মানুষ একই পন্থাবলম্বী ছিল। (অর্থাৎ সবাই ছিল একত্ববাদী। কারণ, আদম (আ) তওহীদের আকীদা নিয়েই এসেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরাও সুদীর্ঘকাল তাঁরই আকীদা ও পন্থায় রয়েছে।) পরে (নিজেদের দুর্মতিত্বের দরুন) তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ থেকে ঘুরে গিয়ে মুশরিক হয়ে গেছে। বস্তুত মুশরিকরা এমন আযাবের যোগ্য যে,) যদি একটি কথা না হত, যা আপনার পালনকর্তার পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে (অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণ আযাব আখিরাতেই দেওয়া হবে), তাহলে যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করছে, তার সর্বশেষ মীমাংসা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। আর এরা বিদ্বেষবশত শত শত মু'জিয়া প্রকাশের পরও বিশেষত কোরআনের

মু'জিযা দেখার এবং এর কোন উদাহরণ উপস্থাপনে অপারক হওয়া সত্ত্বেও) যে, এঁর প্রতি [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আমাদের ফরমায়েশী মু'জিযাগুলোর মধ্য থেকে] কোন মু'জিযা কেন অবতীর্ণ হল না? তাহলে আপনি বলে দিন, (মু'জিযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল রসূলের সত্যতা প্রমাণ করা। তা তো বহু মু'জিযার মাধ্যমেই হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর ফরমায়েশী মু'জিযার কোন প্রয়োজনই নেই। তবে এসব প্রকাশ হওয়া কিংবা না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে, যার সম্পর্ক হল গায়েবের সাথে। আর) গায়েবের ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে (আমার নেই)। সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম (যে, তোমাদের আবদার পূরণ হয় কিনা)। (ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ না করার তাৎপর্য কোরআনের একাধিক জায়গায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলো প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম হল এই যে, এরপরেও যদি ঈমান না আনে, তবে গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বর্তমান এ উম্মতের জন্য এ ধরনের ব্যাপক ও সাধারণ আযাব আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত নয়; বরং একে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফির ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি---বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ব-বাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ)-কে এর মুকাবিলা করতে হয়। (তফসীরে মাযহারী)

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে নূহ (আ)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কাল। এ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষা-গতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক—উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং 'উম্মতে ওয়াহেদাহ্' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফির ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে ঃ فَاخْتَلَفُوا । কোরআন করীমের هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ - আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট আদম সন্তান-দিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া নিদর্শন, যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখাপড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছে। أَعَاذَنَا اللهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ
فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا
تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا
كُنتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا
جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟
أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ
هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ
الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾
إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِۦ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَٰمُ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ

أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا ۙ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ
بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

(২১) আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কল্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলাকলা তৈরি করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরি করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী (২২) তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করার স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্কে তার ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়েঃ 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ, শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে।—পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও—অতপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল, যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য, যারা লক্ষ্য করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আভিধানিক বিশ্লেষণ ঃ عَاصِفٌ তীব্র বায়ু। حَصِيدٌ কর্তিত ফসল। كَأَنْ لَمْ تَغْنَ এটি غَنِيَ بِالْمَكَانِ থেকে গঠিত যার অর্থ হল বসবাস করার কোন স্থান।

আর যখন আমি মানুষকে তাদের উপর কোন বিপদ পড়ার পর কোন নিয়ামতের স্বাদাস্বাদন করিয়ে দেই, তখন সাথে সাথেই আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে অনাচার করতে আরম্ভ করে। (অর্থাৎ তার প্রতি পরাঙমুখতা প্রদর্শন করতে শুরু করে, তার প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাসাত্মক আচরণ করতে থাকে এবং আপত্তি ও বিদ্বেষবশত অন্য মু'জিযার ফরমায়েশ করে এবং বিগত বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ আয়াত মু'জিযাসমূহের প্রতি পরাঙমুখতাই হল তাদের আপত্তির আসল কারণ; বস্তুত এই পরাঙমুখতা সৃষ্টি হয় পার্থিব নিয়ামতসমূহে উন্মত্ত হয়ে পড়ার দরুন। অতপর ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে,) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ অতি শীঘ্রই এই অনাচারের শাস্তি দেবেন। নিশ্চিতই আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সমস্ত অনাচার লিখে রাখছে। (অতএব, আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকা ছাড়াও এগুলো দফতরে সংরক্ষিত রয়েছে।) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) এমন যে, তোমাদেরকে ডাঙ্গায় ও নদীতে নিয়ে ফিরেন। (অর্থাৎ যেসব যন্ত্র-উপকরণের মাধ্যমে তোমরা চলাফেরা কর, তা সবই আল্লাহ্র দেয়া) এমনকি (অনেক সময়) তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ কর আর সে নৌকা অনুকূল হাওয়ার টানে লোকদেরকে নিয়ে যেতে থাকে এবং তারা সেগুলোর গতিতে আনন্দিত হতে থাকে (এমনি অবস্থায় হঠাৎ) সেগুলোর উপর (প্রতিকূল) বাতাসের (প্রবল) ঝাপটা এসে পড়ে এবং তাদের উপর চারদিক থেকে (উত্তাল) তরঙ্গ আসতে থাকে। আর তারা ধারণা করে যে, (বড় কঠিনভাবে) আটকে পড়েছি, (তখন) সবাই নির্ভেজাল বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্কেই ডাকতে আরম্ভ করে, (যে, হে আল্লাহ্) আপনি যদি আমাদেরকে এ (বিপদ) থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যায়পন্থী (অর্থাৎ একত্ববাদী) হয়ে যাব। (অর্থাৎ এইক্ষণে আমাদের মনে তওহীদের যে বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাতে স্থির থাকব। কিন্তু) পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (এই ধ্বংসলীলা থেকে) বাঁচিয়ে তোলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর (বিভিন্ন এলাকার) মাঝে অন্যায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। (অর্থাৎ তেমনি পূর্ববৎ শিরক ও পাপাচার শুরু করে দেয়।) হে মানুষ, (শুনে নাও), তোমাদের এ ঔদ্ধত্য তোমাদেরই জন্য (প্রাণের) বিপদ হতে যাচ্ছে। (সুতরাং) পার্থিব জীবনে (এতে সামান্যই) লাভ করছ, তারপর তোমাদেরকে আমার নিকটই আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে বাতলে দেব (এবং সেগুলোর শাস্তি প্রদান করব।) বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তারপর সে পানিতে যমীনের উদ্ভিদরাজি যা মানুষ ও জীবজন্তুরা ভক্ষণ করে, যথেষ্ট ঘন হয়ে উঠল। এমনকি যখন সে যমীন তার পূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল আর তার সৌন্দর্য চরমে পৌঁছে গেল (অর্থাৎ সবুজের সমারোহে সুদর্শন দেখাতে লাগল) আর সে যমীনের মালিকরা বুঝতে পারল যে, এবার আমরা এ যমীনের (উৎপন্ন ফসলের) উপর পূর্ণ দখল পেয়ে গেছি, তখন (এমতাবস্থায়) দিনে কিংবা রাতে তার উপর আমার তরফ থেকে কোন ধ্বংস (যেমন, তুষার, খরা বা অন্য

কিছু) নেমে এল (এবং) তাতে আমি তাকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিলাম যেন কালও (এখানে) তা মওজুদ ছিল না। (সুতরাং পার্থিব জীবনও এ উদ্ভিদেরই মত।) আমি এমনিভাবে আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকি এমন লোকদের (বোঝাবার) জন্য যারা চিন্তা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আরবী অভিধান অনুসারে مَكْرٌ বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিংবা বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিংবা বাংলায়) مكر বলা হয় ধোঁকা, প্রতারণা, ফেরেববাজি প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখিরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার ওবাল (অশুভ পরিণতি) তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হল জুলুম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।—(আবুশ্-শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ্ কর্তৃক তাঁর তফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۭ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۭ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاۗءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا
بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ
تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

(২৫) আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২৬) যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (২৭) আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ ও অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্র হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরা দিয়ে। এরা হল দোযখবাসী। এরা এতেই থাকতে পারবে অনন্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শিরক করত তাদেরকে বলব ঃ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও---অতপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করনি। (২৯) বস্তুত আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে জানতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে,

যারা মিথ্যা বলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? (৩২) অতএব, এ আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া---সুতরাং কোথায় ঘুরছ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতি আহবান করেছেন এবং যাকে চান সরল পথে চলার তওফীক দান করেন। (যাতে অনন্ত আশ্রয়ে পৌঁছা সম্ভব হয়। অতপর শাস্তি ও প্রতিদানের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে—) যেসব লোক সৎকাজ করেছে (অর্থাৎ ঈমান এনেছে) তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (অর্থাৎ জান্নাত) এবং এর অতিরিক্ত (আল্লাহ্ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ)। আর না (দুঃখের) কালিমা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে, না অপমান। এরাই জান্নাতবাসী। এতে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা (কুফরী—শিরকী প্রভৃতি) অসৎ কর্ম করেছে তাদের অসৎ কর্মের শাস্তি পাবে সমান সমান—(অসৎ কর্মের বেশি নয়।) আর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে অপমান। তাদেরকে আল্লাহ্র (আযাবের) হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। (তাদের চেহারার কালিমা এমন হবে যেন) তাদের চেহারার উপর আঁধার রাতের পরত পরত, (অর্থাৎ টুকরা) দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। এরা হল দোযখের অধিবাসী। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। এছাড়া সে দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি এ সমুদয় (সৃষ্টিকে) কিয়ামতের মাঠে সমবেত করব। অতপর (সমস্ত সৃষ্টির মধ্য থেকে।) মুশরিকদের বলব যে, তোমরা এবং তোমাদের নির্ধারিত অংশীদাররা (যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করতে ক্ষণিক) নিজেদের জায়গায় দাঁড়াও (যাতে তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের স্বরূপ জানিয়ে দেওয়া যায়)। তারপর আমি এ উপাসক ও উপাস্যদের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দেব। তখন তাদের অংশীদাররা (তাদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে না (কারণ, ইবাদতের উদ্দেশ্য হয় মা'বুদকে রাযী করা)। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে আমরা জানতামই না (রাযী হওয়া তো দূরের কথা। অবশ্য এসব শয়তানদেরই তালীম ছিল এবং এরাই রাযী ছিল। এদিক দিয়ে তোমরা তাদেরই ইবাদত করতে)। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজেদের কৃতকর্মের যাচাই করে নেবে (যে, বাস্তবিকই তাদের সে কর্ম লাভজনক ছিল, না অলাভজনক। অতএব, মুশরিকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সুপারিশের ভরসায় আমরা যাদের ইবাদত-উপাসনা করতাম, তারাই তো আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে দিল—লাভের আর কি আশা করব!) বস্তুত এরা আল্লাহ্র

(আযাবের) দিকে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক—প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যাদেরকে এরা উপাস্য গড়ে রেখেছিল সেসব তাদের থেকে সরে পড়বে (এবং হারিয়ে যাবে। কেউই কোন কাজে আসবে না)। আপনি (এসব মুশরিক-অংশীবাদীদের) জিজ্ঞেস করুন, (বল দেখি,) তিনি কে যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক পৌঁছে দেন (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন যাতে তোমাদের রিযিক তৈরী হয়)? অথবা (বল দেখি,) তিনি কে যিনি (তোমাদের) কান ও চোখের উপর পরিপূর্ণ অধিকার রাখেন? অর্থাৎ কে তা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে রক্ষাও করেন আর ইচ্ছা করলে সেগুলোকে অকেজো করে দেন?। আর তিনিই বা কে যিনি জীবন্ত (বস্তু)-কে নির্জীব (বস্তু) থেকে বের করে আনেন এবং নির্জীব (বস্তু)-কে জীবন্ত (বস্তু) থেকে বের করেন (যেমন, বীর্য ও ডিম্ব যা জীবন্তের ভেতর থেকে বের হয় এবং তা থেকে জীবের জন্ম হয়)? আর তিনিই বা কে যিনি যাবতীয় কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন? (তাদেরকে এসব প্রশ্ন করুন—) নিশ্চয়ই এরা (উত্তরে) বলবে যে, (এ সমুদয় কর্মের কর্তা হচ্ছেন) আল্লাহ্। তখন তাদেরকে বলুন, তাহলে কেন (শরীকদেরকে) বর্জন করছ না? বস্তুত (যার এসব কর্ম-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল) তিনিই হলেন আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। (আর যখন এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল,) তখন সত্য (বিষয়) প্রতিষ্ঠার পর (এর বাইরে) গোমরাহী ছাড়া আর কি রইল? (অর্থাৎ যাই কিছু সত্য বিষয়ের বিপরীত হবে, তাই হবে পথ-ভ্রষ্টতা। আর তওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই এখন শিরক নিঃসন্দেহে গোমরাহী।) অতপর (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় (মিথ্যার দিকে) ফিরে যাচ্ছ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতে পার্থিব জীবন এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ এমন আবাদের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যা আকাশ থেকে বর্ষিত পানিতে সঞ্চিত হয়ে লক লক করতে থাকে, আর ফুলে-ফলে ভরে উঠে এবং তা থেকে কৃষাণ আনন্দিত হতে থাকে যে, এবার আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনাদি এর দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কৃত-ঘ্নতার দরুন রাতে কিংবা দিনে আমার আযাবের কোন দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয় যা সেগুলোকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়, যেন এখানে কোন বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না। এ তো হল পার্থিব জীবনের অবস্থা। এর পরবর্তী আয়াতে তার বিপরীতে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ— وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম'-এর মর্মার্থ হল জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হল এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। দ্বিতীয়ত কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পেঁৗছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাআয (র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে নসীহত হিসাবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দারুসসালামের দিকে আহবান করেছেন, তোমরা এ আল্লাহ্র আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌঁছে এই আহবানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ তা কর্মস্থল নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হল জান্নাতের সাতটি নামের একটি।—(তফসীরে কুরতুবী)

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়।

অতপর উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পেঁৗছে দেন।

এর মর্মার্থ হল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হিদায়তও ব্যাপক। কিন্তু হিদায়তের বিশেষ প্রকার—সরল-সোজা পথে তুলে দেওয়া এবং তাতে চলার তওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

উল্লিখিত দু'টি আয়াতে পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের তুলনা এবং পৃথিবী-বাসী ও পরলোকবাসীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী চার আয়াতে এতদু-ভয় শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে জান্নাতবাসীদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বৃহত্তর সৎকর্ম ঈমানে এবং পরে সৎকর্মে সুদৃঢ় রয়েছে তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে শুভ

ও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর শুধু বিনিময় দানই নয় তার চেয়েও কিছু বেশি দেওয়া হবে।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তা হল এই যে, এ ক্ষেত্রে ভাল বদলা বা বিনিময় বলতে অর্থ হল জান্নাত। আর زيادة--এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ যা জান্নাতবাসীরা প্রাপ্ত হবে। [হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে কুরতুবী]

জান্নাতের এটুকু তাৎপর্য সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানই অবগত যে, তা এমন আরাম-আয়েশ ও নিয়ামতের কেন্দ্র যার ধারণা-কল্পনাও মানুষ জীবনে করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ হল সে সমুদয় নিয়ামত অপেক্ষা মূল্যবান।

সহীহ মুসলিমে হযরত সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সা) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে সারবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমাদের কি আরো কোন কিছুর প্রয়োজন রয়েছে? যদি (কারো) থাকে, তবে বল, আমি তা পূরণ করে দেব। এতে জান্নাতবাসিগণ জওয়াব দেবে যে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত বা অব্যাহতি দান করেছেন, এর চেয়ে বেশি আর এমন কি প্রার্থনা করব? তখন আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যবর্তী পর্দা তুলে দেওয়া হবে এবং সমস্ত জান্নাতবাসী আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে। এতে বোঝা গেল যে, বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামত অপেক্ষা বড় ও উত্তম নিয়ামত ছিল এটাই, যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন আবেদন-নিবেদন ব্যতীত দান করেছেন। মাওলানা রুমীর ভাষায়ঃ

ما نبودیم و تقاضۂ ما نبود
لطف تو ناگفتۂ ما می شنود

আমরাও থাকব না এবং আমাদের কোন চাহিদাও থাকবে না, (বরং) তোমার অনুগ্রহই আমাদের অব্যক্ত নিবেদন শুনবে।

অতপর জান্নাতবাসীদের এ অবস্থা বিবৃত করা হয়েছে যে, তাদের মুখমণ্ডলে কখনো মলিনতা কিংবা দুঃখ-বেদনার প্রতিক্রিয়া অথবা অপমানের ছাপ পড়বে না, যেমনটি দুনিয়ার বুকে কোন না কোন সময় সবারই হয়ে থাকে এবং আখিরাতে জান্নাত-বাসীদের হবে।

এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেসব লোক অসৎ কর্ম করেছে তাদেরকে সে অসৎ কর্মের বদলা সমানভাবে দেওয়া হবে তাতে কোন রকম বৃদ্ধি হবে না। তাদের চেহারায় কলঙ্ক-লাঞ্ছনা ছেয়ে থাকবে। কেউই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারার মলিনতা এমন হবে যেন রাতের আঁধার ভাঁজে ভাঁজে তাতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী দুই আয়াতে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা জান্নাতবাসী এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী মূর্তি-বিগ্রহ কিংবা শয়তানের মাঝে হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। ইরশাদ হয়েছে, "সেদিন আমি সবাইকে একত্রে সমবেত করে দেব এবং অংশীবাদীদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের নির্বাচিত উপাস্যরা একটু নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াও, যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের তাৎপর্য জেনে নিতে পার। অতপর তাদের এবং তাদের উপাস্যদের মাঝে পৃথিবীতে যে ঐক্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা ছিন্ন করে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের (উপাস্য) মূর্তি-বিগ্রহগুলো নিজেই বলে উঠবে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতেই না। এরা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে বলবে, তোমাদের শিরকী উপাসনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না! কারণ, আমাদের মধ্যে না ছিল কোন চেতনা স্পন্দন, না ছিল আমাদের কোন বিষয় বুঝবার বুদ্ধি-বিবেচনা।

ষষ্ঠ আয়াতে জান্নাতী ও জহান্নামী উভয় শ্রেণীর একটা যৌথ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রতিটি লোক নিজ নিজ কৃতকর্ম যাচাই করে নেবে যে, তা লাভজনক ছিল, কি ক্ষতিকর। সবাইকে সত্য-সঠিক মা'বুদের দরবারে হাযির করে দেওয়া হবে এবং যেসব ভরসা ও আশ্রয় পৃথিবীতে মানুষ খুঁজে বেড়াত, তা সবই শেষ করে দেওয়া হবে। মুশরিক তথা অংশীবাদীরা যেসব মূর্তি-বিগ্রহকে নিজেদের সহায় ও সুপারিশকারী বলে মনে করত, সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সপ্তম আয়াতে কোরআন হাকীম স্বীয় বিজ্ঞ অভিভাবকসুলভ পন্থায় মুশরিকদের চৈতন্যোদয় করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে——আপনি তাদেরকে বলুন যে, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক সরবরাহ করে? কিংবা কান ও চোখের সে মালিক কে, যিনি যখন ইচ্ছা করেন, তাতে শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি সৃষ্টি করে দেন, আর যখন ইচ্ছা করেন তা ফিরিয়ে নেন? এবং কে তিনি, যিনি মৃত বস্তু থেকে জীবিতকে সৃষ্টি করেন? যেমন, মাটি থেকে ঘাস, বৃক্ষ কিংবা বীর্য থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু অথবা ডিম থেকে পাখি প্রভৃতি। আর কেই বা জীবিত থেকে মৃত বস্তু সৃষ্টি করেন, যেমন, মানুষ ও জীব-জন্তু থেকে নিষ্প্রাণ বীর্য? আর কে আছেন যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের যাবতীয় কার্যাদির ব্যবস্থাপনা করেন?

অতপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যখন মানুষকে এ প্রশ্ন করবেন, তখন সবাই একথাই বলবে যে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তাই এক আল্লাহ্! তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, তাহলে তোমরা কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করছ না? যখন এ সমুদয় বস্তু সামগ্রীর সৃষ্টিকর্তা, এগুলোর রক্ষাকারী এবং এগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্, তখন ইবাদত-উপাসনা পাবার অধিকারী তাঁকে ছাড়া অন্যকে কেন সাব্যস্ত কর?

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ অর্থাৎ ইনিই হলেন সেই মহান সত্তা, যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র

বর্ণিত হল, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না, তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা আবার এমনও হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষঙ্গিক মাস'আলা মাসায়েল ও ফিকাহ্-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতিহাদী মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ বলা যাবে না।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ قُلِ اللّٰهُ
يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ
مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۭ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى
الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۡ كَيْفَ
تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۭ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ
الْحَقِّ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৩) এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদিগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান আনবে না। (৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতপর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ? (৩৫) জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের

মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আভিধানিক বিশ্লেষণ ঃ لَا يَهِدِّيْ এ বাক্যটি আসলে ছিল لَا يَهْتَدِيْ এতে তা'লীল বা সন্ধি-বিচ্ছেদ করে لَا يَهِدِّيْ করা হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে لَا يَهْتَدِيْ এর অর্থই প্রকাশ করে। অর্থাৎ সে লোক যে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় না।

[পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। কেননা, তিনি তাদের ভ্রান্ত মতবাদের দরুন দুঃখিত হতেন। ইরশাদ হচ্ছে—এরা যেমন ঈমান আনছে না] এমনিভাবে আপনার পরওয়ারদিগারের (শাশ্বত) কথা—সমস্ত উদ্ধত লোকের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, 'এরা ঈমান আনবে না।' (তাহলে কেন আপনি দুঃখিত হবেন।) আপনি (তাদেরকে) এভাবে (-ও) বলুন, তোমাদের (প্রস্তাবিত) শরীকদের মধ্যে (তা সেটি সচেতনই হোক—যেমন, শয়তান কিংবা অচেতনই হোক—যেমন, মূর্তি-বিগ্রহ) এমন কেউ আছে কি প্রথমবার (সৃষ্টিকে) উদ্ভব করবে (এবং) পরে (কিয়ামতের সময়) আবারও তৈরি করবে? (এতে শরীকদের অপমানবোধ করে যদি এরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা করে তবে) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ প্রথমবারও সৃষ্টি করেন (এবং) আবার দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। সুতরাং এর (অর্থাৎ একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার) পরেও তোমরা (সত্যবিমুখ হয়ে) কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ? (আর) আপনি (তাদেরকে এ কথাও) বলুন যে, তোমাদের (প্রস্তাবিত) সচেতন শরীকদের মধ্যে (যেমন শয়তান) এমন কেউ আছে কি যে সত্য ও ন্যায়ের পথ বাতলে দেয়? আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ (মানুষকে) সত্য ও ন্যায়ের পথ (-ও) বাতলে দেন। (বস্তুত তিনি বিবেক দিয়েছেন, নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে শয়তান একে তো এসব বিষয়ে সক্ষমই নয়, আর শুধু মন্ত্রণাদানের যে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে সে তা গোমরাহী ও বিভ্রান্তি-করণের কাজেই ব্যয় করে।) কাজেই আবার (তাদেরকে) বলুন যে, আচ্ছা যে সত্য-সঠিক পথ দেখায় সে বেশি অনুসরণযোগ্য, না সে লোক (বেশি যোগ্য) যে বাতলানো ছাড়া নিজেই পথ পায় না—(তদুপরি পথ বাতলানোর পরেও তাতে চলে না—যেমন,) শয়তান? বস্তুত যখন এগুলো অনুসরণযোগ্যই সাব্যস্ত হল না, তখন উপাসনার যোগ্য

কেমন করে হতে পারে? সুতরাং (হে মুশরিক সম্প্রদায়, তোমাদের কি হল) কি সব প্রস্তাব তোমরা উত্থাপন কর? (হাস্যকর বিষয় এই যে, নিজেদের এসব প্রস্তাব বিশ্বাসের পক্ষে এদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণও নেই—) তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে। (অথচ) নিশ্চিতভাবেই ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনা সত্য বিষয়ের (প্রতিষ্ঠার) ব্যাপারে এতটুকুও ফলপ্রসূ নয়। (যাহোক,) এরা যা কিছু করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সমস্ত বিষয়ে অবগত। (যথাসময়ে এর শাস্তি দেবেন।)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٧ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٨ بَلْ كَذَّبُوْا
بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٩ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝٤٠

(৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই—তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিণতি! (৪০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুত তোমার পরওয়ারদিগার যথার্থই জানেন দুরাচারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এ কোরআন মানুষের উদ্ভাবিত বস্তু নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা রচিত হয়ে থাকবে; বরং এটি তো সেসমস্ত গ্রন্থাবলীর সত্যায়নকারী যা ইতিপূর্বে

(অবতীর্ণ) হয়ে গেছে। (আর এটি) প্রয়োজনীয় (আল্লাহ্‌র) নির্দেশাবলীর বিশ্লেষক। এতে সন্দেহ (সংশয়) যুক্ত কোন কথা নেই (এবং) এটি আল্লাহ রব্বুল-আলামীনের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ। সুতরাং এর মান উদ্ভাবিত না হওয়া সত্ত্বেও)। এরা কি একথা বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) আপনি এটি উদ্ভাবন করে নিয়েছেন ? আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (আচ্ছা তাই যদি হয়) তাহলে তোমরাও (তো আরববাসী এবং চারুবাক, বাগ্মীও বটে,) এর মত একমাত্র সূরাই (তৈরি করে) নিয়ে এসো না! আর (একা না পারলে) আল্লাহ্‌কে ছাড়া যাদের যাদের ডেকে নিতে পার সাহায্যের জন্য ডেকে নাও না —যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (নাউযুবিল্লাহ্‌, আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তাহলে তোমরাও রচনা করে আন! কিন্তু মুশকিল তো হল এই যে, এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণে ফায়দা তাদেরই হয়, যারা বুঝতে চায়। অথচ তারা যে কখনো বুঝতেই চায়নি।) বরং (এরা) এমন বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করতে আরম্ভ করেছে যাকে (অর্থাৎ যার ভুল-শুদ্ধের বিষয়টিকে) নিজেদের জ্ঞান-বেষ্টনীতেই আনেনি (এবং তার অবস্থা উপ-লব্ধি করার ইচ্ছাও করেনি। তাহলে এমন লোকদের থেকে বোঝার কি আশা করা যেতে পারে ?) বস্তুত (তাদের এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতার কারণ এই যে,) এখনো এরা (কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ)-এর শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়নি। (অর্থাৎ আযাব আসেনি। অন্যথায় সমস্ত নেশা উবে যেত এবং চোখ খুলে যেত। সত্য ও মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত) একদিন তা (সে পরিণতি) উপস্থিত হবেই। (অবশ্য তখনকার ঈমান লাভজনক হবে না। সুতরাং) যেসব (কাফির) লোক এদের পূর্বে অতি-বাহিত হয়েছে (এবং যেভাবে এরা বিনা যাচাইয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে) তেমনিভাবে তারাও (সত্য ও ন্যায়কে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অবএব দেখুন, সে জালিমদের পরিণতি কেমন (মন্দ) হয়েছে! (এমনি হবে এদেরও) আর (আমি যে মন্দ পরিণতির কথা বলছি এতে সবাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ,) তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা (কোরআন)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসবে। আবার এমনও কেউ কেউ রয়েছে যারা এর উপর ঈমান আনবে না। বস্তুত আপনার পরওয়ারদিগার (এসব) দুরাচারদের ভাল করেই জানেন (যারা ঈমান আনবে না। অতএব, প্রতিশ্রুত সময়ে বিশেষ করে তাদেরকেই শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ এখানে تَأْوِيل-এর মর্মার্থ হল প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কোরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا
أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ
إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

(৪১) আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমার দায়দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য। (৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। (৪৪) আল্লাহ্ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি (এ সমস্ত দলীল-প্রমাণের পরেও) আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে, তবে (শেষ কথা) এই বলে দিন যে, আমার কৃতকর্ম আমি পাব, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমরা পাবে। তোমরা আমার কর্মের জন্য দায়ী নও, আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। যে মতে থাকতে চাও থাক, নিজেই বুঝতে পারবে। (আর আপনি তাদের ঈমানের আশাও বর্জন করুন।) তাদের মধ্যে (অবশ্য) কিছু কিছু লোক এমন (ও) রয়েছে, যারা (বাহ্যত) আপনার প্রতি কান লাগিয়ে বসে থাকে (কিন্তু মনে ঈমানের ইচ্ছা এবং সত্যান্বেষা নেই। কাজেই এদিক দিয়ে তাদের শোনা, না শোনা দুই-ই সমান। তাদের অবস্থা হল বধিরদেরই মত।) সুতরাং আপনি কি বধিরদেরকে শুনিয়ে (তাদের পক্ষে এটা মান্য করার অপেক্ষায়) থাকেন তাদের মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও। (অবশ্য যদি বুদ্ধিজ্ঞান থাকত, তবে এ বধিরতা সত্ত্বেও কিছুটা কাজ হত।) আর (এমনিভাবে) তাদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, (বাহ্যত) আপনাকে (যাবতীয় মু'জিযাও পরিপূর্ণতাসহ) দেখেছে, (কিন্তু সত্যান্বেষা না থাকার দরুন তাদের অবস্থা অন্ধদেরই মত। তাহলে) আপনি কি অন্ধদেরকে পথ দেখাতে চান, অথচ তাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও নেই? (হ্যাঁ, যদি তাদের অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তবে এ অন্ধ অবস্থায়ও

কিছুটা কাজ চলতে পারত। বস্তুত তাদের বুদ্ধিজ্ঞান যখন এমনিভাবে বিলুপ্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে, তখন) একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ মানুষের উপর জুলুম করেন না (যে, তাদেরকে হিদায়ত তথা পথপ্রাপ্তির যোগ্যতা না দিয়েও জওয়াবদিহি করতে আরম্ভ করবেন) বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের (প্রদত্ত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে দিয়ে এবং তার দ্বারা কোন কাজ না নিয়ে) ধ্বংস করে দেয়।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ
بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝
وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ
فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ
لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝
اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝
ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ
لَحَقٌّ ؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا
فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(৪৫) আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যাইহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে। (৫০) তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে? (৫১) তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? (৫২) অতপর বলা হবে গোনাহগারদেরকে, ভোগ করতে থাক অনন্ত আযাব---তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল। (৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদিগারের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না। (৫৪) বস্তুত যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুত তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ; যাকিছু রয়েছে আসমান-সমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে সমবেত করবেন, (যাতে তারা মনে করবে) যেন তারা (দুনিয়া ও বরযখ

তথা মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত সময়ে) গোটা দিনের (মাত্র) এক-আধ দণ্ড অবস্থান করেছিল। (কারণ, সে দিনটি যেমন হবে দীর্ঘ, তেমনি হবে কঠিন। তাই দুনিয়া ও বরযখের সময়ে সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এমন মনে করবে যে, সে সময়টি অতি দ্রুত কেটে গেছে।) আর পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে চিনতে পারবে (কিন্তু একজন অন্যজনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না। এতে তাদের মনে দুঃখ হবে। কারণ, পরিচিত লোকের প্রতি একটা উপকারের সহজাত আশা থাকে) বাস্তবিকই (সে সময়) সেসব লোক (কঠিন) ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যারা আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তারা (পৃথিবীতেও) হিদায়তপ্রাপ্ত ছিল না। (সে কারণেই আজ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যাহোক,) এটিই তাদের প্রকৃত শাস্তির দিন। (তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন।) আর (পৃথিবীতে তাদের উপর আযাব পতিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কথা হল এই যে,) তাদের প্রতি আমি যে (আযাবের) ওয়াদা করছিলাম, তার মধ্য থেকে সামান্য কিছু (আযাব) যদি আমি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায়ই যদি তা তাদের উপর নেমে আসে) কিংবা (তা নেমে আসার পূর্বেই যদি) আমি আপনাকে মৃত্যুদান করি (পরে তা আসুক বা না আসুক) তবে (দুটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। কোন একটা দিকই নির্ধারিত নয়—কিন্তু যেকোন অবস্থায়) আমার কাছে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর (একথা সর্বজনবিদিত যে,) আল্লাহ্ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। সারকথা, দুনিয়াতে শাস্তি হোক বা না হোক, কিন্তু আসল সময়ে তা অবশ্য হবে।) আর (এই যে শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পূর্ণতা ও আপত্তি খণ্ডনের পরই হয়েছে। তাছাড়া তাদেরই কি বৈশিষ্ট্য; বরং সর্বদাই আমার রীতি এই রয়েছে যে, যে সমস্ত উম্মতকে আমি জবাবদিহির যোগ্য সাব্যস্ত করেছি তাদের মধ্য থেকে) প্রতি উম্মতের জন্য একজন বার্তাবাহক হয়েছেন। বস্তুত যখন তাদের সে রসূল (তাদের নিকট) এসে যান (এবং নির্দেশাবলী পৌঁছে দেন, তারপরে) তাদের ফয়সালা ইনসাফের সাথেই করা হয়। (আর সে ফয়সালা এই যে, অমান্যকারীদেরকে অনন্ত আযাবের সম্মুখীন করে দেওয়া হয়।) বস্তুত এদের প্রতি (সামান্যও) জুলুম করা হয় না। (কারণ, পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর শাস্তি দান ইনসাফের পরিপন্থী নয়।) আর এসব লোক (আযাবসংক্রান্ত ভীতির কথা শুনে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) বলে যে; (হে নবী, এবং হে মুসলমানগণ, আযাবের) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে? যদি তোমরা সত্যবাদীই হয়ে থাক তাহলে বাস্তবায়িত করে দিচ্ছ না কেন? আপনি (সবার পক্ষ থেকে উত্তরে) বলে দিন যে, আমি (নিজেই) নিজের জন্য কোন ফায়দা (লাভ) করার কিংবা কোন ক্ষতি (সাধন) করার অধিকার রাখি না, তবে যতটা (অধিকার) আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (সেটুকু অধিকার অবশ্য সংরক্ষণ করি। সুতরাং আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরই যখন মালিক নই, তখন অন্যের লাভ-ক্ষতির মালিক হব কেমন করে! যাহোক, আযাব সংঘটন আমার অধিকারে নেই। তবে তা কবে সংঘটিত হবে—সে ব্যাপারে কথা হল এই যে, এর জন্য) একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে (তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে।) যখন সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন

এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না, এক মুহূর্ত আগাতেও পারবে না (বরং সঙ্গে সঙ্গে আযাব সংঘটিত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তোমাদের আযাবেরও সময় নির্দিষ্ট আছে, তখনই তা সংঘটিত হবে। আর তারা যে আবদার করে যে, যাকিছু হবার শীঘ্রই হয়ে যাক। যেমন مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এবং رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আয়াতে তাদের এ তাড়াহুড়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে) আপনি (এ ব্যাপারে তাদেরকে) বলে দিন যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আযাব রাতে কিংবা দিনে এসে উপস্থিত হয়ই, তবে (একথা বল দেখি) এ আযাবে (এমন) কোন্ বিষয়টি রয়েছে, যার দরুন অপরাধী লোকগুলো তা যথাশীঘ্র কামনা করছে? (অর্থাৎ আযাব তো হল কঠিন বিষয় এবং তা থেকে পরিত্রাণ কামনার বস্তু; যথাশীঘ্র কামনা করার জিনিস নয়। যেহেতু এ তাড়াহুড়ার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সেহেতু বলা হচ্ছে যে, এখন তো একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ যা কিনা বিশ্বাসের ফলপ্রসূ হওয়ার সময়, কিন্তু) পরে যখন সেই (প্রকৃত ও প্রতিশ্রুত বিষয়) এসেই যাবে তাহলে কি (সেসময়) এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে (যখন সে বিশ্বাস ফলপ্রসূ হবে না এবং বলা হবে) হ্যাঁ এখন মানলে। অথচ (পূর্ব থেকে) তোমরা (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে) তার জন্য তাড়াহুড়া করছিলে? কাজেই জালিম (তথা মুশরিকদের) বলা হবে যে, চিরকালীন আযাবের মজা দেখ। তোমরা তোমাদেরই কৃতকর্মের বিনিময় পেয়েছ। তখন তারা (অবাক বিস্ময় ও অস্বীকৃতিবশত) আপনার কাছে জানতে চায় যে, এ আযাব কি কোন বাস্তব বিষয়? আপনি বলে দিন, হ্যাঁ। আমার পালনকর্তার কসম, তা একান্তই বাস্তব বিষয়। বস্তুত তোমরা কোনক্রমেই আল্লাহ্কে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করতে পারবে না (যে, তিনি আযাব দিতে চাইবেন অথচ তোমরা বেঁচে যাবে—তা হবে না।) আর এ আযাবের ভয়াবহতা হবে এমন যে, যদি এক একজন মুশরিকের কাছে এত পরিমাণ (অর্থ সম্পদ) থাকে যাতে সারা পৃথিবী ভরে যেতে পারে, তবুও তার বিনিময়ে তারা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাইবে। (অবশ্য তখন কোন ধনভাণ্ডার থাকবেও না, আর তা গ্রহণও করা হবে না, কিন্তু ভয়াবহতা এমন হবে যে, অর্থ-সম্পদ থাকলে তার সবই দিয়ে দিতে সম্মত হয়ে যেত।) আর যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন (অধিকতর অপমান-অপদস্থতার ভয়ে) লজ্জাকে (নিজের মনে মনেই) লুকিয়ে রাখবে। (অর্থাৎ কথা ও কাজে তার প্রকাশ ঘটতে দেবে না, যাতে করে দর্শকরা আরো বেশি উপহাস না করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আযাবের কঠোরতার সামনে সহ্য করা কিংবা চেপে রাখাও সম্ভব হবে না।) বস্তুত তাদের বিচার ন্যায়ভিত্তিকই হবে এবং তাদের উপর (সামান্যতমও) জুলুম হবে না। মনে রেখো, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু বিদ্যমান সমস্তই আল্লাহ্র স্বত্ব। (এতে যেভাবে ইচ্ছা তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এতে এসব অপরাধীও অন্তর্ভুক্ত—তাদের বিচারও উল্লিখিত পদ্ধতিতে করতে পারেন।) মনে রেখো, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। (সুতরাং কিয়ামত অবশ্যই আসবে) কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। তিনিই প্রাণ

দান করেন, তিনি প্রাণ সংহার করেন। (অতএব, তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কি এমন কঠিন ব্যাপার?) আর তোমরা সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং হিসাব-নিকাশের পর সওয়াব বা আযাব প্রদত্ত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (র) এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না।—(মাযহারী)

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে বলা হবে—آلْآنَ কি এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফিরাউন যখন বলল : آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল— آلْآنَ (অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুত তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আ)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল, কারণ তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হত না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا
فِى ٱلصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ
أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ
حَرَامًا وَحَلَٰلًا ۗ قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾
وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ
مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ
وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ
وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا
فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

(৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ার-দিগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়ত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। ৫৮) বল, আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (৫৯) বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করে-ছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদেরকে কি আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ্‌ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃত-জ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুত যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের

যেকোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যেকোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদিগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এমন এক বস্তু আগমন করেছে, যা (মন্দ কাজ থেকে বাধাদান করার জন্য) উপদেশবাণী-স্বরূপ। আর (যদি এর উপর আমল করে কেউ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, তবে) অন্তরে (মন্দ কর্মের দরুন) যে ব্যাধি (সৃষ্টি) হয়, সেগুলোর জন্য এটি নিরাময় আর (সৎকাজ করার জন্য) পথপ্রদর্শনকারী। বস্তুত (এর উপর আমল করে যদি সৎকাজ অবলম্বন করা হয়, তবে এটি রহমত (এবং সওয়াবের কারণ। আর এসব বরকত হল) ঈমান-দারদের জন্য। (কারণ, তারাই আমল করে থাকে। সুতরাং কোরআনের এসব বর-কতের কথা শুনিয়ে) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (যখন) কোরআন এমনি জিনিস তখন (মানুষকে) আল্লাহ্‌র এহেন দান ও রহমতের উপর আনন্দিত হওয়া উচিত (এবং একে মহাসম্পদ মনে করে বরণ করে নেওয়া কর্তব্য)। এটি এ (দুনিয়া) অপেক্ষা শতগুণে উত্তম, যা তোমরা সঞ্চয় করছ। (কারণ, দুনিয়ার ফায়দা স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী; আর কোর-আনের ফায়দা অধিক ও স্থায়ী।) আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, বল দেখি, আল্লাহ্‌ তোমাদের (লাভের) জন্য যা কিছু রিযিক (হিসাবে) পাঠিয়েছিলেন, পরে তোমরা (নিজের মনগড়া মত) তার কিছু অংশ হারাম আর কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। (অথচ তা হারাম হওয়ার কোনই দলীল প্রমাণ নেই। কাজেই) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি (শুধু) আল্লাহ্‌র প্রতি (নিজের পক্ষ থেকে) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছ? কিয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? (যারা মোটেই ভয় করে না। তারা কি মনে করে যে, কিয়ামত আসবে না কিংবা এলেও আমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না?) সত্যই মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে (যে, সাথে সাথেই শাস্তি দেন না; বরং তওবা করার অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ (তা না হলে তওবা করে নিত)। আর আপনি যেকোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন এবং (সে সমুদয় অবস্থা সত্ত্বেও) আপনি যেকোন খান থেকে কোরআন পাঠ করুন না কেন (এমনিভাবে অন্য যত লোকই হোক না কেন) তোমরা যে কাজই কর, আমি সবকিছুরই খবর রাখি, যখন তোমরা সে কাজ আরম্ভ কর। আর আপনার পালনকর্তার (জ্ঞান) থেকে কোন অণু কণা পরিমাণও গোপন নেই। না যমীনে না আসমানে। (বরং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানে সমুপস্থিত।) আর না (উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা) কোন ক্ষুদ্র বস্তু, না (তার চেয়ে) কোন বড় বস্তু আছে, কিন্তু সে সবই (আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতার কারণে) কিতাবে মুবীন (তথা লওহে মাহফুযে খোদিত) রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতসমূহে কাফিরদের দুরবস্থা এবং আখিরাতে তাদের উপর নানা রকম আযাবের বর্ণনা ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম দু'টিতে তাদের সে দুরবস্থা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার পন্থা এবং আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। আর তা হল আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র আনুগত্য।

মানব ও মানবতার জন্য এ দু'টি বিষয় এমন সুদৃঢ় যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোরআনের নির্দেশাবলী এবং রসূলের সুন্নতের অনুবর্তিতা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই মানুষ বানিয়ে দেয় এবং যখন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ হয়ে যায়, তখন সমগ্র বিশ্ব সুন্দর হয়ে উঠে এবং এ পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হতে পারে।

প্রথম আয়াতে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

এক— مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ — مَوْعِظَةٌ ও وَعْظ --এর প্রকৃত অর্থ হল এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখিরাতের ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়েযায়ে হাসানাহ্'-র অত্যন্ত সালংকার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের কায়া পাল্টে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ-এর সাথে مِّن رَّبِّكُمْ বলে কোরআনী ওয়াযের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়ায নিজেদেরই মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই ; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ও ভীতি-প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি-ওযরের আশংকা নেই।

কোরআন করীমের দ্বিতীয় গুণ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে।

شفاء অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া। আর صدور হল صدر-এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ হল অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষত অন্তরের রোগের শেফা ; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়।---(রূহুল-মা'আনী)

কিন্তু অন্যান্য মনীষী বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়, সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলিম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক লোক রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সা) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— شفاء لما فى الصدور অর্থাৎ কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। (রূহুল-মা'আনী—ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে)

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ্ ইবনে আশ'কা' (র)-র রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে এসে জানালো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন পড়তে থাক।

উম্মতের ওলামাগণ কিছু রেওয়ায়েত, কিছু উদ্ধৃতি এবং কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোরআনের আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা পৃথক গ্রন্থে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ইমাম গাযযালী (র) রচিত গ্রন্থ 'খাওয়াসে-কোরআনী' এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (র) গ্রন্থটি সংক্ষেপ করে 'আমালে কোরআনী' নামে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে যা দেখা যায়, তাতে এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও নিরাময় হিসাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, আত্মার রোগ-ব্যাধি দূর করাই কোরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে আনুষঙ্গিকভাবে এটি দৈহিক রোগ-ব্যাধিরও উত্তম চিকিৎসা।

এতে সেসব লোকের নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা কোরআন-করীমকে শুধু দৈহিক রোগের চিকিৎসা কিংবা পার্থিব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পড়ে বা পড়ায়। না এরা আত্মিক রোগ-ব্যাধির প্রতি লক্ষ্য করে, না কোরআনের হিদায়তের উপর আমল করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এমনি লোকদের ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

ترا حاصل زیس اش جزیں نیست : کہ از ہم خو اندنش اسا ں بمیری

অর্থাৎ তোমরা কোরআনের সূরা ইয়াসীনের দ্বারা এতটুকুই উপকৃত হয়েছ যে, এর পাঠে মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হয়। অথচ এ সূরার মর্ম, তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্যের প্রতি যদি লক্ষ্য করতে, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি উপকারিতা ও বরকত হাসিল করতে পারতে।

কোন কোন গবেষক তফসীরকার বলেছেন যে, কোরআনের প্রথম গুণ مَوْعِظَةٌ -এর সম্পর্ক হল মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে—যাকে শরীয়ত বলা হয়। কোরআন করীম সে সমস্ত আমল সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়। আর شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ -এর সম্পর্ক হল মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে, যাকে তরীকত ও তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।

এ আয়াতে কোরআনের তৃতীয় গুণ هُدًى আর চতুর্থ গুণ هُدًى বলা হয়েছে। رَحْمَةٌ অর্থ হিদায়ত। অর্থাৎ পথ-প্রদর্শন। কোরআন করীম মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। সে মানুষকে বলে যে, সমগ্র বিশ্ব এবং স্বয়ং মানবসত্তার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যে মহান নিদর্শনসমূহ দিয়ে রেখেছেন, সে গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, যাতে তোমরা সেসব বিষয়ের স্রষ্টা ও মালিককে চিনতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃত-পক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন

করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়ত, সততই তার পতনাশংকা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে---هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধনসম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিছেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল فضل (ফজল), অপরটি رحمة (রহমত)। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র 'ফযল'-এর মর্ম হল কোরআন, আর রহমত-এর মর্ম হল এই যে, তোমাদেরকে তিনি কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফিক দান করেছেন।---(রূহুল-মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে)

এ বিষয়টি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হল ইসলাম। বস্তুত এর মর্মার্থও তা-ই, যা উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ফযল-এর মর্ম হল কোরআন, আর রহমত হল নবী করীম (সা)। কোরআন করীমের আয়াত---وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ-এর মাঝেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়। বস্তুত এর সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ কোরআন কিংবা ইসলামের উপর আমল করা রসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যেরই বিভিন্ন শিরোনাম।

এ আয়াতে সু-প্রসিদ্ধ কিরাআত (পাঠ) অনুযায়ী فَلْيَفْرَحُوا গায়েবের সীগা বা নাম পুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এর প্রকৃত লক্ষ্য হল তখনকার উপস্থিত লোকেরা, যার চাহিদা মুতাবিক এখানে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করাই সমীচীন ছিল। যেমন, কোন কোন কিরাআত বা পাঠে তাও রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঠে নামপুরুষই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, রসূলে করীম (সা) কিংবা ইসলামের ব্যাপক রহমত শুধু তখনকার উপস্থিত লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। (রূহুল-মা'আনী)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলীর দ্বারা বোঝা যায় যে, এ পৃথিবীতে আনন্দ-হরষের কোন

স্থান নেই। ইরশাদ হয়েছেঃ—لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ অর্থাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না। অথচ, আলোচ্য আয়াতে নির্দেশবাচক শব্দ ব্যবহার করে আনন্দিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাহ্যত দু'টি আয়াতের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এর এক উত্তর হল এই যে, যেখানে আনন্দিত হতে বারণ করা হয়েছে, সেখানে আনন্দের সংযোগ হল পার্থিব সম্পদের সাথে। পক্ষান্তরে যেখানে আনন্দিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আনন্দের সংযোগ হল আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহের সাথে। দ্বিতীয় পার্থক্য হল এই যে, নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আনন্দই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় আয়াতে সেসব লোকের প্রতি সতর্কীকরণ করা হয়েছে, যারা হালাল-হারামের ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত মতকে প্রশ্রয় দেয় এবং কোরআন ও সুন্নাহ্র সনদ ব্যতীতই নিজের ইচ্ছামত যে-কোন বস্তুকে হালাল কিংবা হারাম সাব্যস্ত করে নেয়। এদেরই উপর কিয়ামতে কঠিন আযাব হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে, কোন বস্তু কিংবা কোন কর্মের হালাল অথবা হারাম হওয়া প্রকৃতপক্ষে মানুষের মতের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা একান্তভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের অধিকারভুক্ত। তাঁদের হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হালাল বলাও জায়েয নয়, হারাম বলাও জায়েয নয়।

চতুর্থ আয়াতে মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক জ্ঞান এবং তার অতুলনীয় বিস্তৃতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আপনি সর্বক্ষণ যে কর্মে এবং যে অবস্থায় থাকেন অথবা কোরআন থেকে যা পাঠ করেন, তার কোন অংশই আমার নিকট গোপন নেই। তেমনিভাবে সমস্ত মানুষ যা কিছু করে, তা আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বস্তুত আসমান ও যমীনের কোন একটি বিন্দুবিসর্গও আমার কাছে গোপন নেই, বরং প্রত্যেকটি বিষয় كِتَابٍ مُبِينٍ অর্থাৎ 'লওহে-মাহফূযে' (সুরক্ষিত পটে) লিখিত রয়েছে।

বাহ্যত এখানে আল্লাহ্র জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং সর্ববিষয়ে ব্যাপকতার বর্ণনা দেওয়ার তাৎপর্য হল এর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, যদিও আপনার বিরোধী ও শত্রু সংখ্যা অনেক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ আপনার সাথে আছে, তাতে আপনার-কোনই ক্ষতি সাধিত হবে না।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্‌র কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

(এ তো গেল আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বর্ণনা। পরবর্তীতে নিষ্ঠাবান ও আনুগত্য-পরায়ণ লোকদের সংরক্ষিত হওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে,) স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধুজনদের উপর না কোন আশংকা (-জনক ঘটনা পতিত হবার ভয়) আছে, না তারা (কোন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দরুন) দুঃখিত বা মর্মাহত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে ভয়াবহ ও আশংকাজনক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেন। আর তারা আল্লাহ্‌র বন্ধু) যারা ঈমান এনেছে এবং (পাপকর্ম থেকে) বিরত থাকে। (অর্থাৎ ঈমান ও পরহিযগারীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। আর ভয় ও শংকা থেকে তাদের মুক্ত থাকার কারণ এই যে,) তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও এবং আখিরাতেও (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে থাকার) সুসংবাদ রয়েছে। (বস্তুত) আল্লাহ্‌র কথায় (অর্থাৎ ওয়াদায়) কোন ব্যতিক্রম হয় না। (সুতরাং যখন সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে তাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা সব সময় সঠিক হয়ে থাকে, কাজেই ভয় ও দুঃখমুক্ত হওয়া অনিবার্য। আর) এটি (অর্থাৎ এ সুসংবাদ যা উল্লিখিত হল) মহান কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখিরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে —যারা আল্লাহ্‌র ওলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহ্‌র ওলী হলেন সে সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া পরহিযগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখিরাতেও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. আল্লাহ্‌র ওলীগণের উপর ভয় ও শংকা না থাকার অর্থ কি? দুই. ওলী-আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? তিন. দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয়-শংকা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখিরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশংকা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশংকা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছাবে তাদের সবাইকে ওলীআল্লাহ্ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলী-আল্লাহর তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তফসীরকার বলেছেন, ওলী-আল্লাহ্‌দের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলী-আল্লাহ্‌দের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবী-তেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। এ ছাড়া আখিরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হল এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ, ওলী-আল্লাহ্‌র তো কথাই নেই স্বয়ং নবী-রসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশংকা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাঁদের ভয়ভীতি অন্যদের তুলনায় বেশিই ছিল। যেমন কোরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। অন্যত্র ওলী-আল্লাহ্‌গণের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগেই বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় করে। কারণ, তাদের পালনকর্তার আযাব এমন জিনিস যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌কে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-সহ অন্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহ্‌গণের কান্নাকাটির ঘটনাবলী ও আখিরাতের ভয়ভীতি সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী-আল্লাহ্গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ হিসাবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণত যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন; পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধনসম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে—আল্লাহ্র ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট পরিশ্রম কোন লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। বরং তাদের অবস্থা হল ঃ

نہ شادی دارد سامانے نہ غم أورد نقصانے
بہ پیش ہمت ما ہر چہ آمد بود مہمانے

(না কোন সম্পদ-সামগ্রী আনন্দ দিতে পারে, না তার কোন ক্ষতিতে দুঃখ আনতে পারে, আমার সৎসাহসের সামনে যা কিছুই আসে, সবই ক্ষণিকের অতিথি মাত্র।)

মহান আল্লাহ্ তা'আলারও প্রেম-মহত্ত, আর তাঁর ভয়ভীতি এসব মনীষীর উপর এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, এর মুকাবিলায় তাদের পার্থিব দুঃখ-বেদনা, আরাম-আয়েশ ও লাভ-ক্ষতির গুরুত্ব তৃণ-কণিকার মত নয়। কবির ভাষায় ঃ

بہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے
یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے

অর্থাৎ 'প্রেমের চলার পথে যারা লাভের প্রত্যাশা করে, তারা প্রেমের কলংক। এ প্রান্তরে চলতে গিয়ে যারা মনযিলের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তারা পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত।'

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি 'ওলী' শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব প্রকৃত উপকরণ হল সেই সংযোগ যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও এই সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আউলিয়াহ্' শব্দে নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং নৈকট্য প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র ওলী। যেমন হাদীসে

কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হল এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এই বিশেষ ওলিত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ স্তর হল সায়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সা)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সূফী-সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা', তথা আত্মবিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হল এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে. যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহর জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল যে তাঁর দেহ মন, বাহ্যাভ্যন্তর সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হল যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম-আহ্কামের অনুগত থাকা। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা ও উচ্চতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলী-আল্লাহ্গণের মর্যাদার বেশকম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ্' (আল্লাহ্র ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা পোষণ করে; কোন পার্থিব উদ্দেশ্য এর মাঝে থাকে না। (ইবনে মারদুবিয়াহ্ থেকে —মাযহারী) আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রসূলে করীম (সা)-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কের সেই রূপ, যা মহানবী (সা) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী (সা)-র সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে কিরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাঁদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন. যারা রসূলে করীম (সা)-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহ্র অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক যিকরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিস বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিস হল আল্লাহ্র যিকর। এ কথাই ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর কাছে প্রশ্ন করল যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাব্বত রাখে, কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌঁছাতে পারে না। হুযূর বললেন ঃ المرء مع من احب অর্থাৎ 'প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসে।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী-আল্লাহ্গণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মুহাব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শা' আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) হযরত রাযীন (রা)-কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে —তা হল এই যে, যারা আল্লাহ্র স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহ্র যিকরে নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মুহব্বত রাখবে—আল্লাহ্র জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহ্র জন্য করবে। —-(মাযহারী)

কিন্তু এ সঙ্গ-সান্নিধ্য তাদেরই লাভজনক, যারা নিজেরাও সুন্নতের অনুসারী ওলী-আল্লাহ্। পক্ষান্তরে যারা রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতের অনুসারী নয়, তারা ওলীত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, তাদের দ্বারা কাশ্ফ-কারামত যতই প্রকাশ পাক না কেন। আর সে লোক উল্লিখিত গুণাবলী অনুযায়ী ওলী হবেন, তাঁর দ্বারা কোন কাশ্ফ-কারামত প্রকাশ না হলেও তিনি ওলী-আল্লাহ্।—(মাযহারী)

ওলী-আল্লাহ্‌গণের লক্ষণ ও পরিচয় প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে একখানি হাদীস হাদীসে কুদসীর উদ্ধৃতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে সে সব লোকই আমার আওলিয়া, যারা আমার স্মরণের সাথে স্মরণে আসে এবং যাদের স্মরণের সাথে আমি স্মরণে আসি।" আর ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ওলী আল্লাহ্‌দের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ- অর্থাৎ যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা মনে হয়, তারাই ওলী।

সারমর্ম এই যে, যাদের সান্নিধ্যে বসে মানুষ আল্লাহ্‌র যিকরের তওফীক লাভ করতে পারে এবং দুনিয়ার মায়া কম অনুভূত হয়, এই হল তাদের ওলী-আল্লাহ্ হওয়ার লক্ষণ।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্‌ফ-কারামত ও গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোঁকা। হাজার হাজার ওলী-আল্লাহ্ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাঁদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্‌ফ ও গায়েবী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আয়াতের শেষাংশে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহ্‌দের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সুসংবাদ---তাতে আখিরাতের সুসংবাদ হল এই যে, মৃত্যুর পর তার রূহ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পরে কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উঠবে তখনও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। যেমন, তিবরানী (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন "যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর অনুসারী মৃত্যুকালেও তাদের কোন ভয় হবে না, কবরেও নয় এবং কবর থেকে উঠার সময়েও নয়। আমার চোখ যেন তখনকার অবস্থা দর্শন করছে, যখন মানুষ কবর থেকে মাটি (ধূলাবালি) ঝাড়তে ঝাড়তে এবং একথা বলতে বলতে উঠবে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যিনি আমাদের চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিয়েছেন।

আর দুনিয়ার সুসংবাদ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, যে সমস্ত সত্য স্বপ্ন যা মানুষ নিজে দেখে কিংবা তাদের জন্য অন্য কেউ দেখতে পায়, যাতে তাদের জন্য সুসংবাদ বিদ্যমান থাকে।---[এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম বুখারী (রা) বর্ণনা করেছেন।]